Indian Science News Association
ESTD.–1935

# বিজ্ঞান কহন

Indian Science News Association
ESTD.–1935

কলকাতা/সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪, সোমবার, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

## ডাক্তার মানেই তো...

শিক্ষা আনে চেতনা। মানব সভ্যতার বিকাশে চেতনার খুব প্রয়োজন। একটু গভীরে গিয়ে বললে বলতে হয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনার প্রয়োজন।বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনা আসে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে।

বিজ্ঞান একটা পদ্ধতির নাম, যা শুধু জানলে হয় না, জীবনে অভ্যাস করতে হয়। এখানে সমাজ বিজ্ঞানেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরিবার ও সমাজেরও কিছু কর্তব্য থাকে।

কিন্তু আমরা যুগে যুগে দেখেছি প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তার উল্টো পথে হেঁটেছে সমাজ। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যার সংখ্যা খুবই কম। যুক্তিবাদী চিন্তার মানুষজন সংখ্যালঘু হলেও তাদের জেদ আর ঐকান্তিক চেষ্টা সমাজকে নাড়া দিয়েছে।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক হয়েছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (বসু)। তখন যা সমাজব্যবস্থা ছিল তাতে এই কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। যেখানে বেশিরভাগ মেয়েরা ছিল অন্দরমহলে বন্দী, সেখানে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চিকিৎসা করা যে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা মানতেই হবে। এব্যাপারে তাকে যোগ্য সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর বিজ্ঞানমনষ্ক ও যুক্তিবাদী স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে ডাক্তারিতে ভর্তির সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাশের হার বেশি। ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর এই লড়াই সমাজের প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে প্রশাসনকে নাড়া দিতে পেরেছিল। তাই আজ সমাজ মেনে নিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মহিলা ডাক্তার বলেন না, ভাবেনও না। ডাক্তারের কোনো জেন্ডার নেই। এখনো মানুষ এই পেশাকে সম্মানের সঙ্গে দেখেন। কোথাও গিয়ে তারা উপলব্ধি করেন ডাক্তার মানেই তাদের জীবন রক্ষক।

মানুষ যখন এই পেশাকে সম্মানের সঙ্গে দেখেন, তখন ডাক্তারদের দায়িত্ব বেড়ে যায়।বেশিরভাগ ডাক্তারই সেই দায়িত্ব পালন করেন। সেজন্যই সমাজব্যবস্থা এখনও টিঁকে আছে।

ডাক্তাররা যখন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, সমাজেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায় ডাক্তারদের প্রতি। এই পরস্পরের দায়িত্ব আসে চেতনা থেকে। এক ধাপ এগিয়ে বললে বলতে হয় বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী চেতনা থেকে। এটাই প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার ধর্ম।

boseprasanta@
hotmail.com
arnab_jour@yahoo.co.in

## ডাঃ আর. জি. কর: এক রেনেসাঁ পুরুষ

### মানস চক্রবর্তী

কলকাতার বেলগাছিয়ায় অবস্থিত আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এক সাম্প্রতিক ঘৃণ্য ঘটনার জেরে খবরের শিরোনামে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত ও সারা বিশ্বের অনেক দেশ এই নামের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু কতজন এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধা গোবিন্দ কর বা আর. জি. করের সম্বন্ধে জানেন? নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে উনিশ শতকের এই রেনেসাঁ পুরুষের কার্যকলাপ জানাবার জন্য এই প্রবন্ধের উপস্থাপনা।

আর. জি. কর হাওড়ায় সাঁতরাগাছির কাছে বেতড়ে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫২ (তাঁর একজন বংশধরের মত অনুযায়ী ১৮৫০) সালের ২৩শে আগষ্ট। তাঁর পিতা ডাঃ দুর্গাদাস কর একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর. জি. কর প্রথমে ১৮৬৯ সালে ও পরে আবার ১৮৮০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৩ সালে এল.এম.এফ. পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি স্কটল্যান্ডে যান। সেখানকার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.আর.সি.পি. ও এল.এম. ডিপ্লোমা অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন।

এরপর তিনি কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন, কিন্তু গরীব রোগীদের তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন। সেই সময় চিকিৎসা বিদ্যা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালো বাংলা পাঠ্য বইয়ের খুবই অভাব ছিল। ছাত্রদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি বাংলায় চিকিৎসা বিদ্যার উপর সহজবোধ্য বই লিখতে শুরু করেন এবং কিছু বই অনুবাদও করেন।

২ >>

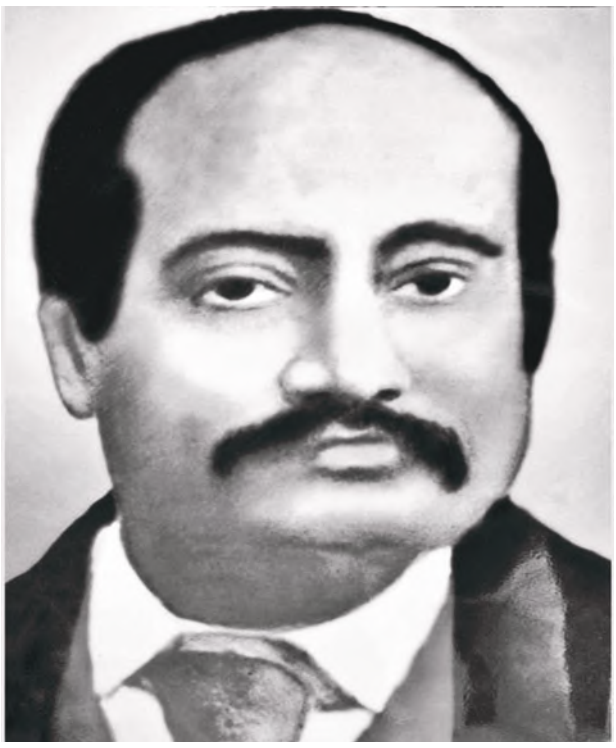

## পার্কিনসনস ডিজিজ নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি

### প্রশান্ত কুমার বসু

"না সারে না। এ রোগ সারবার নয়," বেশ জোরের সঙ্গে বললেন ডাক্তারবাবু। "তবে ওষুধপত্র দিয়ে আমরা কিছুটা দমিয়ে রাখতে পারি।"

আসলে ওঁর হাতটা বেশ কিছুদিন ধরে কাঁপছিল। প্লেটটা হাত থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার অবস্থা। রাস্তায় বেরোলে চলাফেরায় কেমন যেন একটা অস্বস্তি, একরকম একটা জড়তা। এ সব দেখে শুনেই ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এ রোগ যে সারে না এ কথা বিখ্যাত স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ শ্রীনিবাসও স্বীকার করলেন। আসলে এই কঠিন রোগটি একটি "স্লো ডিজেনারেটিভ নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার।" ক্রমাগত অবস্থার অবনতি হতে থাকে। রোগের লক্ষণগুলোও বাড়তে থাকে। উপরোক্ত লক্ষণগুলো ছাড়াও কথাবার্তা জড়িয়ে যায়। স্মরণ শক্তি কমে যায়। ব্যথা বেদনাও বাড়তে থাকে। পারিবারিক ইতিহাস যদি থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ২০১৯ সালে সারা দুনিয়া জুড়ে পার্কিনসনসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল সাড়ে আট কোটিরও বেশি। অবস্থার ক্রমাবনতি হওয়ায় এঁদের মধ্যে ৩,২৯,০০০ জনের মৃত্যু হয়। পরিস্থিতির উন্নতি তো হয়ইনি। বরং বিগত ২০০০ সাল থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় ১০০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন ও মাঝারি আয় বিশিষ্ট দেশগুলোতে যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থাও এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভালো নয়। একটি রিপোর্ট বলছে ভারতে প্রায় ৭ কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই রোগের আক্রমণের মুখে পড়ছেন। পশ্চিমি দুনিয়ার তুলনায় এই পরিস্থিতি হয়তো খুব খারাপ নয়। তবে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে একটি মুস্কিল হল তাঁরা এই রোগের কথা লুকিয়ে রাখতে চান। সমস্যার কথা বলতে চান না। লজ্জা বা ভয় পান বলে এক গবেষক জানিয়েছেন।

এমনিতেই আমাদের মস্তিস্ক খুবই জটিল একটি অঙ্গ যা আমাদের শারীরিক কার্যকলাপ সামগ্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু কোষের সংখ্যা কমতে থাকে। কমে যেতে থাকে ডোপামিন নামে একটি হরমোনের পরিমাণও। তখনই পার্কিনসনসের উৎপাৎ শুরু হয়। তবে এখন কমবয়সীদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হন।

ঠিক এই সময় স্নায়ু চিকিৎসকেরা এমডোপা বা লেভোডোপা নামের এক ধরনের ওষুধ রোগীদের জন্য দিয়ে থাকেন যেগুলো মূলত এক প্রকারের স্টেরয়েড। প্রথমে খুব কম ডোজে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে ডোজ বাড়ানো হয়। রোগের উপসর্গ উল্লেখযোগ

২ >>

## এক ডাক্তারের সংগ্রামের গল্প

### নটরাজ মালাকার

ডেভিড স্যান্ডার্স (১৯৪৫-২০১৯), স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, সেই আন্দোলনের এক অগ্রণী কর্মী। ডেভিডের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে তাঁর বড় হয়ে ওঠা রোডেশিয়ায় (বর্তমানে জিম্বাবোয়ে)। সেই দেশেই তাঁর ডাক্তারি পাশ করা। গ্রেট ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে রোডেশিয়াবাসীর মুক্তির সংগ্রামে অন্যতম অংশীদার হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন ডেভিড। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার সঙ্গে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক।

১৯৭০-এর দশক। রাজনৈতিক হুমকির মুখে পড়লো তাঁর জীবন। রোডেশিয়া থেকে নির্বাসিত হলেন ডেভিড; রাজনৈতিক অভিবাসী হয়ে আশ্রয় নিলেন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে। তবে তিনি রোডেশিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর সওয়াল অব্যাহত রাখলেন। যুক্তরাজ্যে গিয়েও সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি।

ডেভিড ছিলেন শিশুরোগ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। ব্রিটেনে প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর বিরুদ্ধে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউকে পলিটিক্স অফ হেলথ গ্রুপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনে থাকাকালীন তিনি মার্কসবাদী চিকিৎসক ভিসেন্তে নাভারোর লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত আলমা আটা ঘোষণার জোরালো সমর্থক ছিলেন তিনি।

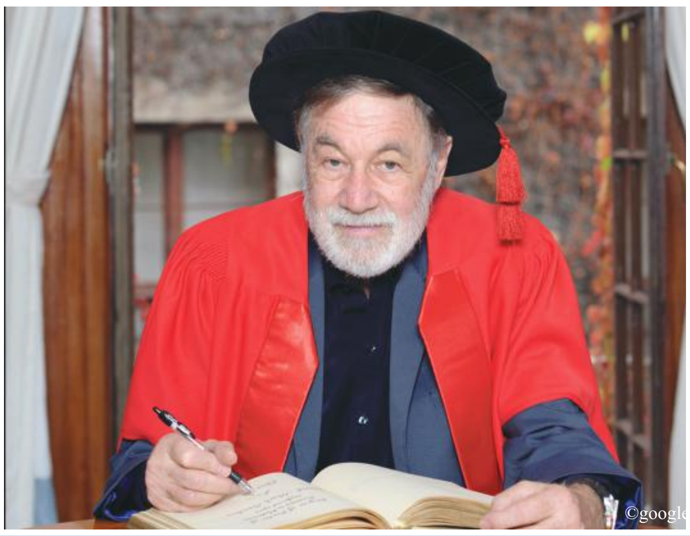


১৯৮০ সাল। স্বাধীনতা পেলো ডেভিডের দেশ। সদ্য স্বাধীন জিম্বাবোয়েতে ফিরে এলেন তিনি। জনমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। আলমা আটা ঘোষণাকে সামনে রেখে ডেভিড ও তাঁর সহযোগীরা কাজ শুরু করলেন। তাঁরা জোর দিলেন সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর যেখানে রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ বেশি প্রাধান্য পাবে। ডেভিড ও তাঁর সহযোদ্ধাদের উদ্যোগের ভালো অগ্রগতি হতে দেখা গেল। তবে সময়ের সাথে সাথে জিম্বাবোয়েতে সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এগিয়ে নেওয়ার পথের বাধাগুলি প্রকটভাবে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও সাধারণ মানুষকে ন্যায্য চিকিৎসা পরিষেবার দেওয়ার যে স্বপ্ন ডেভিড দেখেছিলেন তা আর পূরণ হলো না।

২ >>

Indian Science News Association
ESTD.–1935

**XXXVII Training Programme on Science Communication and Media Practice 2024-2025**

***Organised by***

**Indian Science News Association (ISNA)**

cordially invite you to the
Certificate Award Ceremony of the XXXVII Training Programme (Online): Certificate Course on Basic Training on Science Communication and Media Practice 2024-2025
and the release of Vol. 3, Issue 2 of *e*-Paper '*Bigyan Kahon*'

to be held on

**30th September, 2024 at 3.30 p.m. *via* Google Meet**

**Shri Biswajit Matilal**
Vice-President, Corporate Communication,
Birla Corporation Limited (M.P. Birla Group)
Former Senior Journalist, The Statesman
**will grace the occasion as the Chief Guest**

**Dr. K. Muraleedharan**
President, ISNA
Former Director, CSIR-CGCRI, Kolkata
will preside over the programme

**Prof. Manas Chakrabarty**
Honorary Secretary, ISNA

**Dr. Amit Krishna De**
Convener
XXXVII Training Programme on Science Communication and Media Practice 2024-2025
and
Honorary Secretary, ISNA

**Shri Prasanta K. Bose**
Chairman

Place: Kolkata
Dated: 25/09/2024
Link: **https://meet.google.com/ahr-uhxi-ysf**

***Programme Overleaf***

## জাঠার গল্প
### সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

সেটাও ছিল এক দোসরা অক্টোবর; মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। সাল ১৯৭৭। শুরু হল 'শাস্ত্র সংস্কারিকা জাঠা'। চল্লিশ জনের একটি দল উত্তর কেরলের কামরগড় থেকে যাত্রা শুরু করল। যত দিন যায় তত দল ভারি হতে থাকে। ৩৭ দিনের মধ্যে ১১০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে এই জাঠা। বিভিন্ন গ্রাম, জেলা পেরিয়ে রাজ্যের দক্ষিণে শেষ হয় এই জাঠা। পথে প্রায় ৮৪০ বার জাঠা থামে। আধ মিলিয়ন মানুষ আগ্রহ ভরে শোনেন 'সমাজ বিপ্লবে বিজ্ঞান, 'শ্রম শক্তি শ্রেষ্ঠশক্তি' শীর্ষক নানা বক্তব্য। জাঠায় ছিল সুসজ্জিত নানা ট্যাবলো। সেই জাঠা শেষ হয় ৭ নভেম্বর, বিজ্ঞানী সি. ভি. রমনের জন্মদিনে। এই সফল অভিজ্ঞতা কেরলকে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা কেন্দ্রে পরিণত করে। পিছিয়ে যাই আরও কুড়ি বছর। ১৯৫৭ সালে কেরালার কয়েকজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক সমবেত হয়ে গড়ে তুললেন একটি সংগঠন, নাম 'শাস্ত্র সাহিত্য সমিতি'। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মালয়ালাম ভাষায় লেখা বিজ্ঞান সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলা, তার বিকাশ ঘটানো। তাঁরা একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকাও বের করেন যার নাম 'আধুনিকা শাস্ত্রম' (শাস্ত্রম মানে বিজ্ঞান) তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬২ তে তাঁরা অন্য কয়েকজন সমমনস্ককে নিয়ে গড়ে তোলেন 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ'। ১৯৬৬ অবধি এটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের ফোরাম হিসেবেই কাজ করত, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে

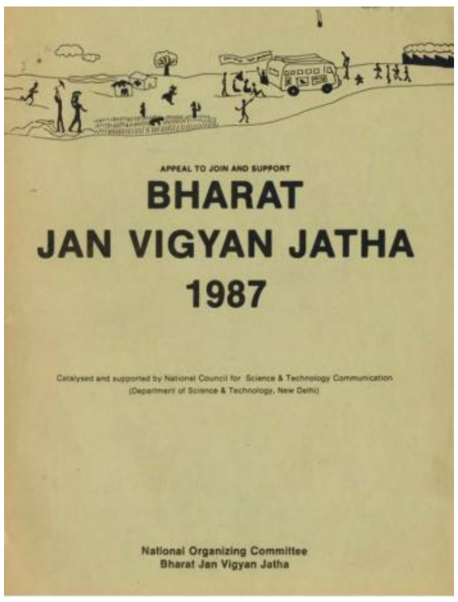


প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাও নয়। ১৯৬৭-তে পরিষৎ অন্যভাবে গড়ে ওঠে। ১৯৬৭-তে গঠনতন্ত্র পঞ্জিকরণের মাধ্যমে শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ-কে সম্পূর্ণ গণ আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়। এর সদস্যপদ, জীবন পরিবর্তনে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এই ভাবনায় বিশ্বাসীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠে 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ' (KSSP)।

১৯৭১ সালে পরিষৎ এক অন্য ধরনের বিজ্ঞান কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচিই হল জাঠা বা যাত্রা। বিজ্ঞানের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া। হাঁটতে থাকা। নানান জায়গায় দাঁড়ানো। রাতে থাকা। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে কথা বলা। সহজ করে তথ্য আর তত্ত্বের কথা বলা। বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরি করা। সেবার কালিকট, শোরানুর আর ত্রিবান্দ্রম থেকে তিনটি জাঠা যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবার আদান-প্রদান ঘটে। যে বিষয় এতকাল ধরে মনে করা হত সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, তাকে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন জাঠায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানকর্মীরা; এঁদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। এই জাঠা শেষ হয় পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন কেন্দ্রে।

এরপর থেকেই এই জাঠা KSSP-র কাজের একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৭৩-এ চালু হয়েছে বিজ্ঞান প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন, যাতে মিলেছে অভূতপূর্ব সাড়া; প্রায় দেড় হাজার ক্লাসে অংশ নিয়েছে দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ। এই জনশিক্ষা আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হয়, পাশাপাশি চলতে থাকে মাতৃভাষা মালয়ালামে পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশনা। পরিষৎ পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে শাস্ত্রগাথী, শাস্ত্রকেরলম, ইউরেকা, গ্রামশাস্ত্রম এবং বালশাস্ত্রম। এছাড়া বের হয় সদস্যদের জন্য সংবাদ বুলেটিন 'পরিষৎ বার্তা'। শিক্ষা, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং স্বনির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া হয়। আর জাঠা কেরলের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে ওঠে ১৯৮৭তে। ভারত সরকারের উদ্যোগে দেশ জোড়া বিজ্ঞান প্রচারের কাজ শুরু হয় জাঠার মাধ্যমে। কর্মসূচির নামই ছিল ভারত জন বিজ্ঞান জাঠা।

ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sabya4@gmail.com

## পার্কিনসনস ডিজিজ...

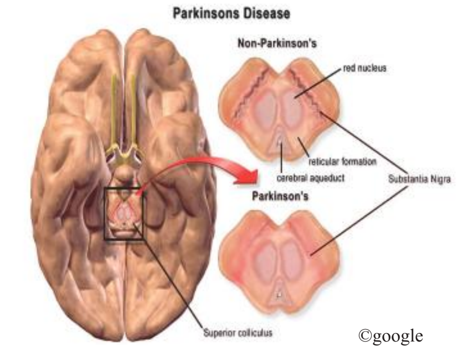


ভাবে না হলেও কিছুটা কমতে থাকে। তবে ওষুধে সমস্ত কাজ হয় না বলে জানালেন ডঃ শ্রীনিবাস। ডাক্তাররা রোগী বা রোগিনীদের এম আর আই করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যাতে বোঝা যায় মস্তিষ্কের কোন জায়গা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার পরিমাণ কতটা। এবারে আসে শল্য চিকিৎসার প্রশ্ন। দক্ষিণ গোলার্ধে খুবই জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি ডিপ ব্রেন স্টিমিউলেশন বা ডিবিএস। এই পদ্ধতিতে প্রথমে মস্তিষ্কের আক্রান্ত জায়গায় একটা ফুটো করে ডট পেনের রিফিলের মত একটি ইলেকট্রোড প্রবেশ করানো হয়। একই সঙ্গে কাঁধের হাড়ের নীচে বুকে আর একটি অস্ত্রোপচার করে পেসমেকারের মত একটি যন্ত্র ঢোকানো হয়। এখান থেকে ঐ ইলেকট্রোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠিয়ে "শক" দেওয়া হয় যাতে মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয় অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। "আর সেখানেই বোধহয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠান কিছুটা এগিয়ে আছে," বলে দাবী করলেন বিশিষ্ট এই স্নায়ু চিকিৎসক। এই দাবীর কথা ব্যখ্যা করতেই গত ৬ই সেপ্টেম্বর এক ওয়েবিনারে ডেকেছিলেন কয়েক জনকে। সাংবাদিক হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন শুধু আপনাদের সম্পাদক।

ডঃ শ্রীনিবাস ২০ জন বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ ভারতে কোয়েম্বাটুরে স্নায়ু চিকিৎসার এক বিশাল হাসপাতাল। আট বছর আগে তৈরী এই হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা ৫৫০ যা অনতিবিলম্বে দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে জানালেন ডঃ শ্রীনিবাস। নিরন্তর গবেষণা এই হাসপাতালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সেই গবেষণার অঙ্গ হিসেবে ওঁরা তৈরী করেছেন এমন একটি যন্ত্র যার জন্য প্রয়োজন একটি এম আর আই ব্যবস্থা। একটি ফুটবলকে দুই অর্ধে কেটে ফেলে একটি অংশের সমান একটি হেলমেটের মত দেখতে ঐ যন্ত্রটি রোগীর মাথায় চাপিয়ে এম আর আই চেম্বারে প্রবেশ করান হয়। রোগীর মাথা তার আগে সম্পূর্ণ কামিয়ে নেওয়া হয়। আরও কিছু প্রস্তুতি থাকে। ছোটখাট নানা যন্ত্রাংশ ছাড়াও হেলমেটটি ঘিরে থাকে মোট ১০২৪টি "ট্রান্সডিউ-সার" যাদের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ মস্তিষ্কের আক্রান্ত জায়গায় পাঠানো হয়। পুরো পদ্ধতিটির নাম "সনিকেশন।"

"বিশ্বাস করুন, শব্দ তরঙ্গ অভিঘাতের ফল অচিরেই দেখা যায়। যে রোগী এতদিন কম্পমান দুই হাতের সাহায্য নিয়ে জল ভর্তি একটি কাঁচের গ্লাস ধরতেন, দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই তিনি ঐ রকম একটি গ্লাস ধরেছেন একটি হাত দিয়েই। এবং তাও কোন কাঁপুনি ছাড়াই। কথা বলায়ও জড়তা চলে যাচ্ছে। প্রায় স্বাভাবিক একটি মানুষ!" জানালেন ডঃ শ্রীনিবাস।

তাছাড়া এই পদ্ধতির আর একটি সুবিধাও আছে। কোন কাটা ছেঁড়া করতেও হয়না। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলা হয় "নন ইনভেসিভ" পদ্ধতি। অন্যদিকে ডিবিএস-এ একবার মস্তিস্কে এবং একবার বুকে অস্ত্রোপচার করতে হয়। সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রোগীকে পনেরো দিন বাদে বাদে এসে "ক্যালিব্রেশন" করাতে হয়। নাহলে সুফল পাওয়া যায় না। "অথচ আমাদের এখানে রোগীকে একবারই আসতে হয়। পরে কোন সমস্যা হলে একটি ভিডিও কলই যথেষ্ট," তিনি বলেন। আমার প্রশ্ন ছিল ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘ দিন এমডোপা জাতীয় স্টেরয়েড ওষুধ খেলে সুগার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে কি করণীয়? ডঃ শ্রীনিবাস বললেন, সে রকম হলে ওষুধের মাত্রা এবং পরিমাণের মধ্যে একটি সমতা আনতে হবে। "বিকজ, মেডিসিন ইস দ্য কর্নারস্টোন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট।" আমাদের পদ্ধতিতে রোগী প্রায় ৭৫ শতাংশ সুস্থ হয়ে যান এবং লেভোডোপা সেবনের মাত্রাও কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় একই শতাংশ কমে যায় বলে তিনি আবারও দাবী করলেন।

সবই তো হল। এখন প্রশ্ন খরচ কি রকম? তিনি স্বীকার করলেন, এ পদ্ধতি একটু ব্যয়বহুল। হাসপাতালে থাকা, নার্সিং, "কনজিউমেবলস" ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হতে পারে। "তবে সেই দিন পর্যন্ত অমরা আমাদের পদ্ধতিতে মোট ১২০ জন রোগীর সফল চিকিৎসা করেছি। তাঁদের আর আমাদের হাসপাতালে ঘুরে আসার প্রয়োজন হয়নি," বললেন এই বিশিষ্ট চিকিৎসক। এবার আপনারা কি করবেন ভাবুন।

প্রশান্ত কুমার বসু
সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

## তদন্তে যখন ময়না...
### সায়রী বিশ্বাস

ধরা যাক, আপনি রেললাইনে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন। মৃত্যু কোন দুর্ঘটনার কারণে, নাকি আত্মহত্যা, নাকি খুন বোঝা যাবে কি করে? আইনের চোখেই বা সেটা প্রমাণ করবেন কিভাবে? এখানেই ডাক পড়ে আজকের "শার্লক হোমস"দের, অর্থাৎ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের। এখানে মৃতদেহের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অংশ কাজে লাগে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করতে। পোস্টমর্টেম অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু তার সাথে ময়না পাখির কি সম্পর্ক? বাংলায় তা ময়না তদন্ত কেন? আসলে কালো রঙের পাখিটির এখানে কোন ভূমিকাই নেই। এ হলো আরবি "ময়না" বা "মুয়াইনা"। আরবি শব্দ মুয়াইনা বাংলায় এসে রূপভেদে হয়ে গেছে ময়না যার অর্থ ভালো করে খোঁজা বা অনুসন্ধান করা। কোন মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা খতিয়ে দেখতেই করা হয় ময়না তদন্ত, যা অপরাধবিজ্ঞানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পোস্টমর্টেম এর প্রমাণ পাওয়া গেছে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দেও। সে সময়ে মিশরে মানুষের মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কাঁটাছেঁড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এটিই ময়না তদন্তের প্রাথমিক প্রমাণ। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল। তখন এর রিপোর্টে বলা হয়েছিল জুলিয়াস সিজারকে মোট ২৩ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, যার মধ্যে বাম কাঁধের নিচের একটা আঘাতই মৃত্যুর জন্য মূলত দায়ী। ইতিহাসে এটাই ময়নাতদন্তের প্রথম নথিভুক্ত নিদর্শন।

যদিও ফরেনসিক বিজ্ঞান মানে শুধু ময়নাতদন্ত নয়। বিজ্ঞান আর আইনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার তাগিদে অপরাধের জায়গা থেকে পাওয়া বিভিন্ন জিনিসের হাজারো রকমের পরীক্ষায় লাগে বিজ্ঞানের প্রায় সব রকমের শাখা। চিকিৎসা বিজ্ঞান, ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান, কীট বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, গতিবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, রসায়ন, সংখ্যাতত্ত্ব কি নেই সেখানে। সন্দেহভাজন ব্যক্তির মনস্তত্ত্বও অপরাধের কিনারা করতে একটা বড় হাতিয়ার। নার্কো টেস্ট, পলিগ্রাফ টেস্ট এগুলো সবই এখন

পরিচিত শব্দ।

আমাদের আরেকটি অতি পরিচিত শব্দ ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালাইসিস। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ১৮৫৮ সালে স্যার উইলিয়াম হার্শেল প্রথম লক্ষ্য করেন যে আঙুলের ছাপ প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং সারা জীবন তা একই রয়ে যায়। ফলে অপরাধী সনাক্তকরণে আঙুলের ছাপের ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৭৭ সালে হুগলির জেলাশাসক হয়ে আসার পর তিনি বিভিন্ন চুক্তিপত্র ও দলিলে সই এর পরিবর্তে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করার প্রথা চালু করেন। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ফিঙ্গারপ্রিন্টধুল ব্যুরো, বিশ্বের প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো এবং অপরাধী সনাক্তকরণের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর প্রমাণ গ্রহণযোগ্য বলে গৃহীত হয়। আর এর সাথে জড়িয়ে যায় দুই কৃতি বাঙালি পুলিশ অফিসারের নাম - কাজী আজিজুল হক এবং হেমচন্দ্র বোস। হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মানুষের আঙুলের ছাপ কে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে তারা বিন্যস্ত করেছিলেন। যে কোন অপরাধের তদন্তের কাজে আঙুলের ছাপ আজকের এই কম্পিউটার আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর যুগেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জামাকাপড়, অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস সহ মৃতদেহের বাইরের ভেতরের প্রতিটি খুঁটিনাটি তো দেখা হয়ই, এমনকি ঘটনাস্থলে থাকা যেকোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে অমূল্য রতন। আসলে প্রমাণের অভাবে অপরাধীর মুক্তি পেয়ে যাওয়া বা ভুল প্রমানে নির্দোষের সাজা পাওয়া কোনোটিই যে কাঙ্খিত নয়।

সহ অধ্যাপিকা
ড. সুধীর রঞ্জন শূর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এন্ড স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দমদম

## ডাঃ আর. জি. কর...

ছাত্র থাকাকালীনই আর. জি. কর বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙালিদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের খুবই প্রয়োজন, যেখানে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শেখানো হবে। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ কর ও আরও কয়েকজন বাঙালি চিকিৎসক মিলে বৈঠকখানা বাজার রোডে "ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন" প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৬ সালে। এর শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। এটি এশিয়ার প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ।

কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করার পর বেলগাছিয়ায় ১২ বিঘা জমির এই কলেজ ও হাসপাতাল স্থানান্তরিত হয়। এর নামও পরিবর্তিত হতে হতে ১৯৪৮ সালে এর নতুন নাম হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

বেলগাছিয়ায় এই জমি কেনার জন্য আর. জি. কর তাঁর নিজের সব সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। বিভিন্ন ধনী লোকেদের বিবাহ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অর্থসাহায্য চাইতেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র

রায়ের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলেই ১৯৪৮ সালে আর. জি. করের নামে হাসপাতালের নামকরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

ডাঃ আর. জি. কর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ১৯১৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর প্রয়াত হন। ডাঃ করকে বাঙালিদের চিরকাল মনে রাখা উচিৎ, এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মত্যাগ, আন্তরিক প্রচেষ্টা, বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার, এবং তাঁর বিভিন্ন মানবদরদী কাজকর্মের জন্য।

মানস চক্রবর্তী
সম্পাদক, ইসনা
chakmanas09@gmail.com

## সংগ্রামের গল্প ...

ফলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ডেভিড যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন সেই সময়ে সেখানে বর্ণবাদী শাসন চলছে। তিনি দেখলেন শ্বেতাঙ্গ অভিজাত ও কালো সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে সম্পদ এবং স্বাস্থ্যের বিরাট বৈষম্য। সেখানে চলছে বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন। বর্ণবৈষম্যের জন্য সেই সময় চিকিৎসকদের সংগঠনও ভেঙে যাচ্ছে। ব্ল্যাক কনসায়েন্স মুভমেন্টের একজন স্পষ্টভাষী নেতা স্টিভ বিকুর নির্যাতনকে কেন্দ্র করে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ আফ্রিকা (MASA) থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে আসেন এবং ন্যাশনাল মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন (NAMDA) গঠন করেন। নামডা জাতিগত সমতার জন্য লড়াই শুরু করেছিল। গড়ে তুলেছিল কমিউনিটি বা সম্প্রদায়-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নেটওয়ার্ক। ডেভিড যুক্ত হলেন নামডার কর্মসূচির সঙ্গে।

১৯৯১ সালে নিকারাগুয়া ইন্টারন্যাশনাল পিপলস হেলথ কাউন্সিল (আইপিএইচসি) এবং ২০০০ সালে বাংলাদেশের পিপলস হেলথ মুভমেন্ট (পিএইচএম) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ডেভিড। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একাধিক বই ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি।

নটরাজ মালাকার
natarajandulberia@gmail.com

## বিজ্ঞান প্রযুক্তি লেখা নিয়ে দুচার কথা

দেবপ্রসন্ন সিংহ

সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এক সারিতে আনার চেষ্টা বহুকাল থেকেই। বহু বিষয় সমূহের অংশবিশেষ প্রাধান্য পেতে পেতে আরও বেশি এষণা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অধ্যয়ন ও বাণিজ্যকে যেভাবে আনতে চাইছে তাতে আমাদের সাবেকী অনেক ধর্মেরই সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, চর্চা, ধ্যান লোপ পেতে বসেছে। এ বর্তমান যুগে নতুন কথা নয়। যুগে যুগে বিপ্লবের এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এই এগিয়ে চলাকে পিছিয়েও দেওয়া যাবে না। দেখা যায় আর এক কৌশলগত প্রয়াসে নব প্রজন্ম তাদের বিবিধ বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অতিব্যবহারে তীব্র অনুশাসনে সাম্প্রতিক পূর্ব প্রজন্মকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং অধিকতর জীবনশৈলীর হাতছানিতে তা নিজস্ব বাজি জিতে নেয়, সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত হলেও।

এই ছোট নিবন্ধে এটুকু বলা যে বেশ কিছু বিজ্ঞান ইতিহাস, পরম্পরা এবং, বোধ করি, পরীক্ষিত ও স্বীকৃত সংস্কৃতি ক্রমশ নিজেদের আলো স্তিমিত করে ফেলছে, এক কথায় অবহেলিত হচ্ছে। তাদের প্রাসঙ্গিকতা আমরা হাতড়াতে ও হারাতে থাকি এবং সেই বিজ্ঞান লেখা, সেই প্রযুক্তিও, যা ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি মেশানো, স্বাভাবিক বুদ্ধি নিয়ে কোন বিশেষ বোধে আনন্দ ও স্বস্তি পেতে । 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' এসে পড়েছে। আজ আরও প্রবলভাবে, অনেক বিষয় ব্যবহারের মধ্যে, সুরক্ষাও চরম বেড়া বা জালও। দুইয়েরেই দাপটে কেউ হাঁসফাঁস করি, কেউ দ্রুত খোঁজখবর নিয়ে ভাসতে থাকি। চলতে থাকে বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তিগত কারিগরি ও কারিকুরিতে দ্রুত ধামাকা ও চমকদারিতে ক্রম-চর্চা ও ক্রম-বাণিজ্য।

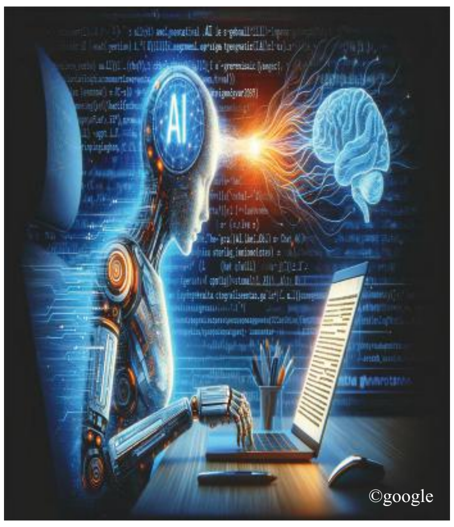

©google

আমরা এখনকার বুদ্ধি ও রক্ষা একপ্রকার ইনপুট স্তরে সঁপে দিতে দিতে ইনটারনেটে বহু বিষয়ের সড়কে খুঁজতে থাকি নব নব সম্ভাবনার পথ, সমাধানের দিশা। মূলত আরও ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ও নেশায় আর এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি লব্ধ জ্ঞান নিয়ে শতসহস্র যান্ত্রিকতার সুফলের রেণু গায়ে মেখে এগোই।

বিজ্ঞানের অদূরে এক দুর্ভাবনা এসে পড়েছে। বিজ্ঞান লেখক পাঠকের সংখ্যা আগের থেকে কত কমেছে বা বেড়েছে, এমন তালিকা অজানা, তবে এই সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা বা লেখা সরকারি বা বেসরকারি মহলে বেশ কম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনিয়মিতভাবে নিয়মিত লেখাগুলি বিবিধ সংবাদপত্রের পাতায় এসে দেখা দেয়, বেশি থাকে বাণিজ্যের বা পরিষেবার প্রক্রিয়ায় বা বণিকী গতিবিধিতে। সোসাল মিডিয়ার বহুরূপ তাকে টেনে নিতে চায়। লেখাগুলি কখনো তাই গভীর শিক্ষা হয়ে ওঠে না, হয়ে পড়ে গভীর ভ্রান্তি। অজস্র লেখার ও অজস্র পড়ার উৎস শুধুমাত্র লেখাপড়ায় নয়, এর ঠিকঠাক সময়মত প্রচারে, জানান দিয়ে পড়ানোয়। নতুন আকাশ বাতাস মাধ্যমে সংখ্যা ভয়াবহ আকারে পড়ার যে নিরিখ দেয় তার সত্যতা নিয়ে সংশয় জাগে। চটজলদি ভালো লাগার দ্রুত নিরুত্তাপ উত্তর বা ইমোজি কতজনে স্থির চোখে দেয় ও মনে রাখে?

অবশ্য প্রচারে বিবৃতি কখনো বা ছোট একটি নিবন্ধ এক ঝলকে যে খুশি আনে, তা কে অস্বীকার করবে ?

মূল কথা, মনীষীদের, বিজ্ঞানীদের কতশতদের জীবনকাহিনী জানা জানানোও হারিয়ে যাছে, তাঁদের জন্মদিন মৃত্যুদিন দিবস সম্ভ্রম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলেও। গুগলে যতটা প্রথম চেষ্টায় তথ্য আপলোড হয়েছে, পড়ে উদভুত তথ্যে, পরে বই মারফত এসেও অনেকের কাছে ডাউনলোড হয়ে ওঠেনি, অসম্পূর্ণতা আজো বিদ্যমান। হয়ত এর জন্য দায়ী আরও বিশাল তথ্য, তার সম্পাদন, অশোধন ও অসংঘটিতরূপে ছড়ানোয়। অসীম তথ্যের ভীড়ে ভারে এর থেকে এক ভিন্ন বোধ তাই আসতেই পারে। বোধকরি অদলবদল বা আবাহন বিসর্জন অনিবার্য হয়ে পড়েছে এক নব পড়া ও লেখার সমীকরণের আবির্ভাব ও আকর্ষণ, অনেক কিছু উপাদান নিয়ে, বিশেষ করে উত্তরপ্রজন্মে এইদিকে যাতে আরও বেশি নজর ও আলো পড়ে।

devaprasannasinha1211
@gmail.com

## পরিবেশ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা

ঝিলিক সাহা

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে, এবং এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা অতুলনীয়। গ্রাসরুট লেভেল থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত নারীরা পরিবেশ রক্ষা ও টেঁকসই উন্নয়নের প্রয়াসে অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবেশ আন্দোলন আরও শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ হয়েছে।

প্রথমত, গ্রামীণ ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীরা পরিবেশ সুরক্ষার মূল সৈনিক হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন দেশে নারীরা বন রক্ষা, জল সংরক্ষণ, এবং কৃষি জমির টেঁকসই ব্যবস্থাপনার মতো কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। উদাহরণস্বরূপ, চিপকো আন্দোলনে ভারতের গ্রামীণ নারীরা গাছ কাটার বিরুদ্ধে গাছকে আলিঙ্গন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই আন্দোলন পরিবেশ রক্ষার এক অন্যতম মাইলফলক হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, নারীরা পরিবেশ রক্ষায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। তারা শুধুমাত্র পরিবেশের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক নন। বরং, তারা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রেটা থুনবার্গের নেতৃত্বে "ফ্রাইডে ফর ফিউচার" আন্দোলন গোটা বিশ্বে তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তৃতীয়ত, নারীরা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা যেমন বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তেমনি সৌর শক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন, এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহারের প্রসার ঘটাচ্ছেন। এ ধরনের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা পরিবেশ দূষণ কমাতে এবং টেঁকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে।

চতুর্থত, নারীরা পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। তারা শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করছেন এবং তাদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরছেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত করছেন।

সবশেষে, নারীদের পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। নারীরা যখন পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তখন তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়, যা সমগ্র সমাজের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।

পরিবেশ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা একটি টেঁকসই ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। তাই, পরিবেশ রক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন আরও বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

সহকারি অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কিংসটন ল কলেজে, বারাসত

©google

## অ্যাস্ট্রোবায়োলজি মহাবিশ্বে জীবন?

শিবশঙ্কর পালিত

জীবন কি? পৃথিবীতে জীবন কি করে শুরু এবং বিকশিত হয়?

মহাবিশ্বের অন্য কোনো জায়গায় কি জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে? খুব আকর্ষণীয়, তাই না? কিন্তু, এটা দর্শন নয়, এটা অ্যাস্ট্রোবায়োলজি!

©google

চিত্র: অ্যাস্ট্রোবায়োলজি গ্রাফিক (পিক্সাবে - সম্পাদিত)

অ্যাস্ট্রোবায়োলজি হল এমন একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়, যেখানে মহাবিশ্বে জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ এবং স্থায়িত্ব নিয়ে গবেষণা করা হয়। এই বিষয়বস্তুকে বোঝার জন্য জীববিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়। অ্যাস্ট্রোবায়োলজির গবেষণা শুধু যে পৃথিবীর বাইরে জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে তা নয়, বরং পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশ কি করে হয়েছিল সে নিয়েও কাজ হয়।

অ্যাস্ট্রোবায়োলজির একটি বড় গবেষণা ক্ষেত্র হল এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরে থাকা গ্রহগুলি। বিগত ১৯৯৫ সালে প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫,৫০০ টির বেশি এক্সোপ্ল্যানেট পাওয়া গেছে। এই গ্রহগুলি জীবন ধারণের উপযোগী কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়। শুধু মাত্র আমাদের সৌরজগতের বাইরে নয়, আমাদের সৌরজগতেও পৃথিবী ছাড়া বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে জীবনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হল, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ এবং বৃহস্পতির চাঁদ - ইউরোপা ও শনির চাঁদ -এনসেলাডাস।

অ্যাস্ট্রোবায়োলজির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এক্সট্রিমোফাইলদের নিয়ে গবেষণা। এক্সট্রিমোফাইল হল সেই সব জীবাণু, যারা চরম পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। যেমন গভীর সমুদ্রের তাপ, উচ্চ রেডিয়েশন, বা অতি অম্লীয় বা ক্ষারীয় পরিবেশ। এই জীবাণুদের অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি যে মহাবিশ্বের বিভিন্ন চরম পরিবেশেও জীবনের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

আমেরিকায় অবস্থিত, নাসা অ্যাস্ট্রোবায়োলজি ইনস্টিটিউট এই বিষয়ে বিগত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। এছাড়া ভারতেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও সংস্থা ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কাজ শুরু করেছে। ভারতের ডঃ অঙ্কন দাস, আই.এ.এস.ই.এস কলকাতার একজন গবেষক, অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি এবং অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে মহাবিশ্বের রসায়ন এবং জীবনের সম্ভাব্যতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন।

আই.আই.এস.আই.আর,' পুনের ডঃ সুধা রাজামনি জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি নিয়ে কাজ করছেন। পশ্চিম বঙ্গের বারাসাতে অবস্থিত 'লাইফ-টু এন্ড বিয়ন্ড ফাউন্ডেশন', নামক একটি নন-প্রফিট সংস্থা, তরুণ বিজ্ঞানী এবং মহাকাশ গবেষকদের জন্য এক অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। এখানে গবেষণা, শিক্ষা এবং আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রোবায়োলজির প্রসার ঘটানো হয়। অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি মুম্বাইয়ের- 'অ্যামিটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন অ্যাস্ট্রোবায়োলোজি', হল ভারতে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে এক অন্যতম প্রধান গবেষণা কেন্দ্র।

অ্যাস্ট্রোবায়োলজির গবেষণা আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য দিচ্ছে এবং এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন আবিষ্কার এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। মহাবিশ্বে জীবনের সন্ধান, আমাদের অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে, যা আমাদের পৃথিবীর বাইরে জীবন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও জানতে সহায়ক হবে।

ছাত্র, ইসনা
sibsankarpalitcheminspace@
gmail.com

## তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় সংকট

দেবব্রত সুর

মৌলিক পদার্থবিদ্যার একটি সমস্যা আছে যেটি প্রায় একটি দুঃস্বপ্নের দৃশ্য। একটি সংকটে রয়েছে। পদার্থবিদরা সম্মত হন যে বিশ শতকে সাধারণ আপেক্ষিকতা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং এক ডজন মৌলিক কণার আবিষ্কার হয়েছে এবং একুশ শতকের প্রথম ত্রৈমাসিক এগুলির আরও নিশ্চিতকরণ নিয়ে এসেছে।

পদার্থবিদরা জানেন যে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে তাঁদের কঠোরভাবে জিতে নেওয়ার বোঝা অসম্পূর্ণ। তাঁরা জানেন না কেন নির্দিষ্ট কণার ভর আছে, কী ধরণের অদৃশ্য জিনিসগুলি গ্যালাক্সিগুলিকে একত্রে ধরে রেখেছে বা কোন ধরণের শক্তি মহাবিশ্বের প্রসারণকে চালিত করছে। পদার্থবিদদের সমীকরণও রয়েছে যা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে কীভাবে অণুগুলি চলে, কীভাবে পরমাণুগুলি বিভক্ত হয় এবং কীভাবে পরমাণুর হৃদয় একত্রিত হয়। তাঁরা জুম করা চালিয়ে যেতে পারেন শুধুমাত্র ১০-৩৫ মিটার সীমার মধ্যে। এর চেয়ে কম দূরত্বে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়। মহাবিশ্বের প্রতিটি নির্দেশনা অদৃশ্য নোটবুকে লেখা আছে কিন্তু আমরা অজ্ঞ।

কণা পদার্থবিদরা কণাগুলিকে কাছাকাছি ক্র্যাশ করার চেষ্টা করছেন, কী ঘটছে তা দেখছেন এবং তাঁরা যে অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক আচরণগুলি দেখেছেন তা ক্যাপচার করার জন্য গণিতের বিকাশ ঘটাচ্ছেন। এটি সুইজারল্যান্ডে এলএইচসি (LHC) নামক ২৭-কিমি রিং তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যা ১০-১৯ মিটারে প্রোটনের সংঘর্ষ এবং প্রকৃতি অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিগুলিকে ডেকে আনতে পারে। পরবর্তী প্রজন্মের কোলাইডারের পরিধি ১০০ কিমি হবে বলে আশা করা যায়।

পদার্থবিদরা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ, ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ এবং বিগ ব্যাং-এর প্রতিধ্বনি শোনার জন্য গভীর মহাকাশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সংক্ষেপে, মহাবিশ্ব পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি চরম। তাই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম বুঝতে আমাদের মহাজাগতিক আতশবাজিই অধ্যয়ন করতে হবে।

সবাই ২০৩০ সালে এলআইএসএ(খওঝঅ)-র অপারেশনে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে যখন তারা বিগ ব্যাং-এর পরে এক সেকেন্ডের প্রথম ভগ্নাংশের সময় উৎপন্ন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (এড) তোলার প্রত্যাশা করে। সেই প্রারম্ভিক মুহূর্তে, কিছু পদার্থবিজ্ঞানী মনে করেন, মহাবিশ্ব একবারে একাধিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল ফুটন্ত জলের পাত্রের মতো। যদি তাই হয়, বুদ্বুদ শুরু হয়ে যেত স্থান-কালের লহর যা LISA শুনবে।

সদস্য, ইসনা
sur_debu@hotmail.com

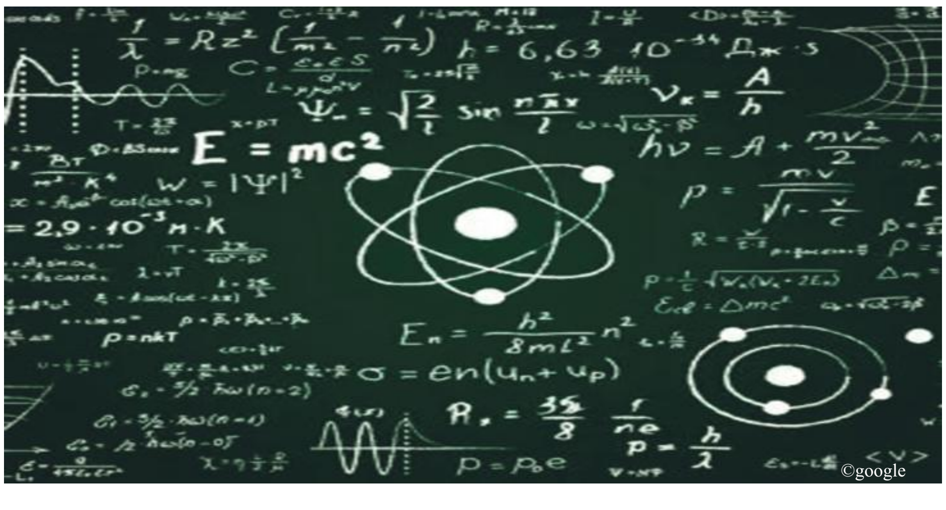

©google

# বাংলার নদ-নদী
# কপিল ভট্টাচার্যের সতর্কবার্তা

আমির মন্ডল

অসংখ্য নদ-নদী নিয়ে গঠিত বাংলা। নদ-নদীকে বাদ দিয়ে বাংলাকে কল্পনা করা কঠিন। অতীতে বিশিষ্ট এক বাঙালি ঐতিহাসিক বলেছিলেন - বাংলার নদীগুলির ইতিহাসই আসলে বাংলার ইতিহাস। ছোট-বড় এই সব নদ-নদীকে তিনি বাংলার 'প্রাকৃতিক ধনসম্পদ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে নদ-নদী নিয়ে ১৯৫৪ সালে কপিল ভট্টাচার্যের 'বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলার নদ-নদী সম্পর্কে এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। তিনি এই গ্রন্থে নদী নিয়ে যুক্তিসংগত, নির্মোহ ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে নদীর খাত পরিবর্তন, ব-দ্বীপ গঠন (কর্মঠ, মুমূর্ষু ও পরিণত), সুন্দরবনের গঠন, নদী ভূ-গর্ভ কাটে কেন, নদীতে কীভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ইত্যাদি বিষয়। এছাড়া ফারাক্কা ব্যারেজ, দামোদর পরিকল্পনা ও কলকাতা বন্দরকে নিয়েও যুক্তিনিষ্ঠ চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। তবে গ্রন্থটি সবথেকে

বেশি নজর কেড়েছিল ফারাক্কা ব্যারেজ, দামোদর পরিকল্পনা ও কলকাতা বন্দর সম্পর্কে সম্ভাব্য সতর্কবার্তা তিনি দিয়েছিলেন বলে।

কপিল ভট্টাচার্য প্রায় সাত দশক আগে প্রস্তাবিত ফারাক্কা ব্যারেজের প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন- "ফারাক্কা ব্যারেজের ফলে বিহারে সর্বনাশা প্লাবনের সৃষ্টি করবে, পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলায় একটা বিপর্যয়ের কারণ প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যারেজ ও দক্ষিণ স্থলের শক্ত মাটির সংঘাত সম্পূর্ণ অপর পাড়ে কূল ভাঙতে ব্যবহৃত হবে।" ঠিক একই ভাবে দামোদর পরিকল্পনা নিয়ে জানিয়েছিলেন- দামোদর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কলকাতা বন্দর ধ্বংস হবে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে ভাগীরথী ও হুগলি নদীতে প্রতিবছর বন্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

তার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী কলকাতা বন্দর ১৯৬০ সালের মধ্যে ধ্বংস না হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ তার বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরদিকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদী ভাঙনের গ্রাসে তলিয়ে যাচ্ছে। ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য এই দুই জেলাকে আজও অনেক খেসারত দিতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য এখনও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। তিনি বলতেন প্রকৃতিকে তার মতো করে বুঝে নানাভাবে মানব কল্যাণের কাজে বিজ্ঞান ও টেকনিককে কাজে লাগাতে হবে। আর আধুনিক চিন্তাধারাতে প্রকৃতিকে কন্ট্রোল নয়, সেই সহাবস্থানের কথা বারবার স্বীকার করা হচ্ছে। বাস্তবে অতীতে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা করার সময় সেটা সবসময় মানা হয়নি।

তবে এর পরেও সমসাময়িককালে অনেকে তার গ্রন্থটি নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি। একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা তাঁকে 'পাকিস্তানের চর' বলেও অপবাদ দিয়েছিল। আসলে তৎকালীন সময়ে ভারত সরকারের বিভিন্ন নদী পরিকল্পনার ত্রুটিগুলির তিনি সমালোচনা করেছিলেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সভায় নদী পরিকল্পনা নিয়ে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এই সব কিছু স্বীকার করে বলা যায়, তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় নদী অববাহিকা সম্পর্কে জটিল 'বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল' বিষয় সহজবোধ্য করে সাধারণ পাঠকের কাছে পেশ করেছিলেন।

তাঁর এই অসাধারণ কাজটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের সাত দশক পরেও আজও সেটি সমানভাবে জনপ্রিয়। বাংলার নদ-নদী পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জানতে কপিল ভট্টাচার্যের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
amirmondal28852@gmail.com

# সবুজ বিবাহ

সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য

বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে থাকে অনেক আনন্দ, সাজগোজ, নাচগান, খাওয়াদাওয়া। কিন্তু সাময়িক এই আনন্দই আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের কতটা ক্ষতি করছে তা হয়তো আমরা সবসময় ভেবে দেখিনা। গাড়ি সাজানোর, বিয়েবাড়ির দরজা আর দেওয়াল সাজানোর রাশি রাশি ফুল বিয়েবাড়ি মিটলেই পরিণত হয় আবর্জনায়। সঙ্গে বাড়তি খাবার, ফয়েল, প্লাস্টিক, থার্মোকলের বোঝা। আজকাল বাংলার ঘরে ঘরেও শোনা যাচ্ছে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে মাইকের উচ্চ শব্দ।

ধর্মীয় নিয়মকানুন ও লোকাচারে ঘটে জলদূষণ, বায়ুদূষণ। বিয়ের কনে সহ মেয়েরা যেসব সাজগোজ করেন রাসায়নিক যুক্ত মেক-আপ ও মেহেন্দি দিয়ে, তা ক্ষতি করে ত্বকের। দূরপাচ্য ও অতিরিক্ত মশলাদার খাবার, ঠাণ্ডা পানীয় এসব ছাড়াও যেন বিয়েবাড়ি ভাবাই যায়না। কিন্তু সত্যিই কি স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে রক্ষা করে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কোনো উপায় নেই? এই প্রশ্নের উত্তর সবুজ বিবাহ।

শুরু থেকেই পরিবেশ দূষণ হ্রাস, আবর্জনার মাত্রা হ্রাস, স্বাস্থ্যরক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সবুজ বিবাহের আয়োজন করা হয়। বিয়ের কার্ড লেখা হয় হাতে, পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাগজে। গাছ থেকে ছেঁড়া ফুল দিয়ে নয়, টব সমেত ফুলের গাছ দিয়ে বিয়েবাড়ি সাজানো হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জড়ির পোশাক আর ধাতব অলঙ্কার। এই দুই শিল্পই চড়া মাত্রায় কার্বন পদচিহ্ন সৃষ্টি করে। ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেটের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর পোশাক শিল্পে ১ হাজার ৫০০ বিলিয়ন লিটার জল দূষণ ঘটে।

উপরন্তু ফ্যাশন-সচেতনতার কারণে আমাদের আজকের প্রিয় পোশাকটাই আগামী বছরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ইউএনএফসিসিসির অনুমান অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক শিল্পের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি পাবে আরও ৩০%। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে হলে আমাদের পোশাকের আয়ু বৃদ্ধি করা এবং রকমফের কমিয়ে আনা জরুরি।

অলঙ্কার শিল্পের চিত্রটিও আলাদা নয়। ওয়ার্ল্ড বিজনেজ কাউন্সিল ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের রিপোর্ট তাই ধাতু ও রত্নের অলঙ্কারের উৎপাদনকে কার্বন পদচিহ্নের বড় উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সমীক্ষায় জানা গেছে প্রতিটি রুপোর আংটি তৈরির প্রক্রিয়ায় ১.৩ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

সবুজ বিবাহে তাই পুনর্ব্যবহারযোগ্য পোশাক, পরিবেশবান্ধব অলঙ্কার এবং রাসায়নিক বর্জিত সম্পূর্ণ জৈব উপাদানে তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করা হয় সাজসজ্জায়। মাইকের ব্যবহার বন্ধ করে খালি গলায় গানের ব্যবস্থা শব্দদূষণ রোধ করার পাশাপাশি আন্তরিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। খাওয়াদাওয়ার নির্বাচন ও রান্নার ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতদের স্বাস্থ্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। সাইকেল বা রিক্সার মতো পরিবেশবান্ধব যানবাহন, বিদ্যুতের পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস সবুজ বিবাহে ব্যবহার করা হয়। অযৌক্তিক কোনো আচার-অনুষ্ঠান, যা পরিবেশের ক্ষতি করে এবং অর্থের অপচয় ঘটায়, খোলা মনে সেসব দূর করতে পারাটা অবশ্য সবুজ বিবাহের সার্থকতার একটা বড় শর্ত।

একথা ঠিক যে এই বিকল্প আয়োজনে অনেক বেশি পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরিবেশ বাঁচানোর প্রয়োজনটা যদি তাত্ত্বিক আলোচনার স্তর ছাপিয়ে উঠে জীবনের দাবি হিসেবে প্রাধান্য পায়, তাহলে হয়তো সবুজ বিবাহের এই নতুনত্বকে খুব একটা কঠিন মনে হবে না।

ছাত্রী, ইসনা
sanchalitabhattacharyya@gmail.com

# যানবাহন থেকে পরিবেশ দূষণ ?

মনামী মণ্ডল

প্রাচীনকালের মানুষেরা এক স্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পদসঞ্চালনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এরপরে ঘোড়া, গাধা বা গরুর মতো প্রাণীদের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থা পরিচালিত হত। প্রায় ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় চাকার আবিষ্কার পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় অত্যাধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল।

অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষের এই পথের সাথী হয়ে উঠেছে বায়ুদূষণের একটি প্রধান কারণ। বায়ুদূষণের শতকরা ৬০ ভাগ উপাদানই যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া থেকে আসে। এই ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড, সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন জাতীয় গ্যাস থাকে। এগুলি মূলত মানুষের শরীরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি ব্যাধির সৃষ্টি করে। এছাড়া ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট পারঅক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে ব্যাঘাত ঘটায়।

এই উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বুকেই কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলনের নজির দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮৪ সাল নাগাদ সরকারি উদ্যোগে 'কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' 'ন্যাশনাল এয়ার মনিটারিং প্রোগ্রাম'এর মাধ্যমে সারা দেশের বায়ুদূষণের পরিমাণের মাপজোখ শুরু করেছিল। এই প্রকল্পটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া ও হলদিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও বায়ুদূষণ রোধ করতে ভারত সরকার 'মোটর ভেহিকেলস আইন, ১৯৮৯'-এর অধীনে প্রত্যেকটি গাড়ির 'পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল' শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করেছিল। এই নথিটি একটি গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ পরীক্ষা করার পরে প্রদান করা হত। এমনকি এই শংসাপত্রটি না থাকলে গাড়িগুলিকে জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশির দশক থেকেই বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংগঠনগুলি আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। তৎকালীন 'হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি'র প্রচারপত্রের শ্লোগানে বলা হতো- 'হাওড়াতে আমরা নিশ্বাস নিই বেঁচে থাকার কারণে নয়, মৃত্যুর জন্য'। পরবর্তীকালে, ২০০৫ সালে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। বিশেষ করে রাতের দিকে কলকাতা ও হাওড়া জেলার বাতাসে দূষিত গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে বলে তিনি দাবি করেছিলেন। এর ফলে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার একটি 'মনিটরিং কমিটি' তৈরি করেছিল। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ'-এর সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখা। ঐ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট ২০০৯ সালের মার্চ মাসে পনেরো বছরের পুরানো গাড়ির ব্যবহার বন্ধ করার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল। এরপরে রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ যথাযথ পরিমাপ করার জন্য একটি 'রিমোট সেন্সিং ডিভাইস' তৈরি করেছিল। বায়ুদূষণ কিন্তু কোনোভাবেই কমানো যায়নি।

২০১১ সালে 'কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও পরিবেশ দপ্তর' কলকাতা ও হাওড়া জেলাতে অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানিয়েছিল যে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী নয়টি অঞ্চলের মধ্যে সাতটি অঞ্চল বায়ুদূষণের কারণে 'বিপজ্জনক ভাবে দূষিত'। ফলে ২০১২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' 'পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল' সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো গাড়িকে জ্বালানি বিক্রি করা যাবে না এমন নির্দেশ জারি করেছিল। এ ছাড়া এল.পি.জি, সি.এন.জি, সি.বি.এম ব্যাটারির মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাতদফা প্রস্তাব পাশ করেছিল।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রস্তাবটি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণকুমার মিশ্র ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ওই সুপারিশ কিভাবে কার্যকর করা যায় তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে ছ'সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। যদিও সুভাষবাবু জানিয়েছেন যে, সরকার এ বিষয়ে কোনো তৎপরতা দেখায়নি।

একবিংশ শতাব্দীতে যানবাহন দূষণের আর একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোটরবাইক। নামী অটোমোবাইল সংস্থার মোটরবাইকগুলিতে অতিরিক্ত কিট ও যন্ত্র লাগানোর কারণে বাইকের গতি বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। বাইক রূপান্তরের আগে ও পরে একটি মোটরবাইকের দূষণ পরীক্ষা করেছিল 'হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি'।

দেখা যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় মোটরবাইক থেকে নির্গত ধোঁয়াতে যে পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে তা রূপান্তরের পরে অনেক বেড়ে যায় এবং ইঞ্জিনের শব্দ ১০ ডেসিবেল বেশি হয়। এইজন্য সমিতির পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত হাওড়ার পুলিশ সুপারকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, 'মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট' ও বায়ুদূষণ আইনের পরিপন্থী কোনো মোটরবাইক কিট পাওয়া গেলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে ধরা হবে।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রযুক্তির ভুল ব্যবহারই ডেকে আনছে পরিবেশের সর্বনাশ। তাই পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সঠিক পদ্ধতিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার কাজটিও করতে হবে, যেটি পরিবেশ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যও বটে।

manami.history@
gmail.com

# কিশলয়ের আঙিনায়

শিল্পী: ঋষান চৌধুরী
নার্সারী,
স্কুল : ক্লাউনফিশ অফ দ্যা ব্রিটিশ স্কুল অফ বেজিং

শিল্পী: দীভিষা মুখার্জী
নবম শ্রেণী,
স্কুল- জি ডি গোয়েঙ্কা
পাবলিক স্কুল দক্ষিণেশ্বর

## পৃথিবীর ছাতা ফুটো হতে শুরু করেছে

সীমা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর ছাতা ফুটো হতে শুরু করেছে

ঘরের বাইরে বের হতে হলে রোদ বৃষ্টি আটকাতে আমাদের ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়। ছাতা হল আমাদের মাথার উপরের একটা আচ্ছাদন যা আমাদের প্রয়োজনে রক্ষা করে। পৃথিবীরও ছাতা রয়েছে। এটা ওজোন নামে এক ধরনের গ্যাস দিয়ে তৈরি। পৃথিবীর ছাতা খালি চোখে দেখা যায় না বা আমাদের মত খোলা বন্ধ করা যায় না। তবে পৃথিবীকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। আকাশের দিকে তাকালে যে মেঘ দেখতে পাওয়া যায় তার উপরে রয়েছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার(stratosphere) বা শান্ত মন্ডল। এই স্তরে বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন সূর্যের আলোর প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এটা দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপা ওজন নয়, এই ওজোনকে বলা যেতে পারে অক্সিজেনের দাদাভাই। অক্সিজেন তৈরি হয় দুটি পরমাণু দিয়ে আর ওজোন তৈরি হয় তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে।

বেশ কিছুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঘটনার জন্য মূল দোষারোপ করা যেতে পারে মানুষের বিবিধ কার্যকলাপ। সিএফসি (ক্লোরোফ্লুয়োরো কার্বন) মানুষের হাতে তৈরি একটি কৃত্রিম গ্যাস। এর বাণিজ্যিক নাম ফ্রিয়ন। এই গ্যাস রেফ্রিজারেশন, এরোসল, প্লাস্টিক, ফোমের তাপ নির্ধারক পদার্থ, প্যাকেজিং শিল্প, স্প্রে, রং এবং নানা রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থ গুলি উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় বিপুল পরিমাণে সিএফসি বাতাসে মেশে বায়বীয় অবস্থায়, এবং পরবর্তীকালে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে। এছাড়াও কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, হ্যালোন, মিথাইল ক্লোরোফরম ইত্যাদি ওজোন ধ্বংসে পারদর্শী। এদের একসঙ্গে বলা হয় ওডিএস বা ওজোন বিনষ্টকারী পদার্থ।

বিগত ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে পরিবেশের বিষয় নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি মন্ট্রিল প্রোটোকল নামে বিখ্যাত। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব জুড়ে ওজোন ধ্বংসকারী পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করা। ১৯৮৯ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়েছিল। পরে কয়েকটি সংশোধনও হয়েছে।

বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে প্রতি বছর ১৬ই সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর রক্ষা দিবস পালন করা হয়।

-----

সদস্য, কার্যকরী সমিতি, ইসনা

## স্যান্ডউইচ থিওরি

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

গুড মর্নিং কাকাই!

ভেরি গুড মর্নিং মুকু — তা সকাল সকাল পড়ালেখা ছেড়ে মুকু মণির কাকাই এর ঘরে কি..., আর আমার নোটবুকের ভিতরে কি এতো অনুসন্ধান পর্ব চালিয়ে যাচ্ছ শুনি। ও হো আজ ব্রেকফাস্টে স্যান্ডউইচ, বৌদিমণি বানিয়েছে বুঝি! আজ্ঞে না, আজকে আমি বানিয়ে এনেছি, খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে, কিন্তু তার আগে বলো তোমার নোটবুকে লাল রঙে হাইলাইট করা এই স্যান্ডউইচ থিওরী টা কী?

স্যান্ডউইচ থিওরী, বাপ রে! কি করে বোঝাই তোমাকে মুকু মণি, ওটা যে বড়দের বিষয়। ওকে, তাহলে তুমি আমাকে ছোটদের মতো করেই বোঝাও — আসলে মুকু ব্যাপারটা ঠিক তোর বানানো এই স্যান্ডউইচ এর মতোই, এই যে তোর স্যান্ডউইচ এর উপর নীচে এক পিস্ করে ব্রেড ও মাঝখানে ফিলিং মানে তরকারি টা দিয়েছিস, এখন আমি যখন এটা খাব তখন উপর নীচের ব্রেড আমার পেটে গেলে ওর মাঝখানে থাকা তরকারি টাও একই সাথে আমার পেটে যাবে, এটাই স্যান্ডউইচ থিওরী।

কাকাই, কি যে বলো না — আরে বাবা দু'পিস্ ব্রেডের মাঝখানে তরকারি দিয়েই তো স্যান্ডউইচ বানানো হয়, কেউ খেলে এই তিনটে স্তরই একসাথে পেটে যাবে, এর আবার থিওরী কি!

ওটাই তো মুকুমণি, উচ্চতর গণিতের রিয়েল অ্যানালিসিস যখন পড়বে তখন বুঝবে। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুসজ্জাত তিনটি ফাংশন বা অপেক্ষক একটি নির্দিষ্ট নিয়মে যদি প্রথম ও দ্বিতীয় অপেক্ষক একটি নির্দিষ্ট মানে উপনিত হয়, তাহলে তাদের মধ্যবর্তী তৃতীয় অপেক্ষকটিও ওই নির্দিষ্ট নিয়মে একই মানে উপনীত হবে, এটাই স্যান্ডউইচ থিওরী।

বুঝেছি কাকাই, আচ্ছা কাকাই আজ তুমি মেডিটেশন করেছ— হম্, আচ্ছা মুকু বল তো, একজন পদার্থবিদ মেডিটেশন করলে মুখে কি আওড়াবে? উঁহু জানিনা গো, তবে তুমি তো ওঁম ওঁম করো। একদমই। সেইজন্যই তো একজন ফিজিসিস্ট ওহম ওহম করবে! ভারি মজা বল (হা হা হো হো হি হি) — আচ্ছা মুকু তুই ভেবেছিস তুই বড় হয়ে কি হতে চাস। হুম্, আমি তোমার ওইসব স্যান্ডউইচ থিওরী, কোয়ান্টাম থিওরী বুঝিনা বাপু, আমি কাকাই বিউটি থেরাপিস্ট হতে চাই।

ও তাই, তাহলে বল দেখি একজন কোয়ান্টাম থিওরিস্ট এবং একজন বিউটি থেরাপিস্ট এর মধ্যে তফাৎ কি? তা তো জানি না কাকাই। হুঁ হুঁ, তাহলে শোন, একজন কোয়ান্টাম থিওরিস্ট ফাউন্ডেশন হিসেবে প্ল্যাঙ্কস্ কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করেন, আর একজন বিউটি থেরাপিস্ট ফাউন্ডেশন হিসেবে ব্যবহার করেন ম্যাক্স ফ্যাক্টর! (হো হো হো হো) হাসলে চলবে না— আরে তোর এই ডিজাইনার ড্রেসটা আগে দেখিনি তো, কি দিল রে! মামাই। ও তাই বুঝি।

আচ্ছা বলতো একজন বায়োলজিস্ট মানে জীববিজ্ঞানী, তিনি যদি কোন পার্টিতে যান তাহলে কি পরে যাবেন — এটা আমি জানি কাকাই— বল বল শুনি— ডিজাইনার জিনস্! আরেব্বাস্, এই তো শিখে ফেলেছিস, তবে বিউটি থেরাপিস্ট হোস কিংবা বিউটি কুইন, মনের মধ্যে সবসময় বিজ্ঞান টা কিন্তু পুষে রাখিস।

দেখেছেন এতো এতো বকবকম করে চলেছি সমানে, অথচ আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ই করিনি, ও মুকু আমার ভাইঝি, আমি ওর কাকাই, একজন সায়েন্স কমিউনিকেটর। বুঝিয়ে বললে আমি একজন বৈজ্ঞানিক যে কিনা সৃজনশীলতা দিয়ে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় গুলোকে লেখা ও কথার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করে।

আচ্ছা কাকাই, এই যে বললে, তা বিজ্ঞানী আর বৈজ্ঞানিক এর পার্থক্য কি? — ধুর পাগল একটা, এটাও জানিস না, যাঁদের মন ও মাথা দুটোতেই বিজ্ঞান তাঁরা বিজ্ঞানী; আর যাঁদের সততই মনে মনে বিজ্ঞান তাঁরা বৈজ্ঞানিক! যিনি বিজ্ঞানী তিনি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক, কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক জরুরি নয় তিনিও একজন বিজ্ঞানী।

বুঝেছিস— হুমমম। পাকু মুকু!

-----

প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

## পায়ে পড়ি বাঘ মামা
নবীনা রায় মজুমদার

"আমি জাতীয় আমি বাঘ"
"লালচে চোখ, সর্বদা সজাগ
পেটে খিদে, মনে রাগ
রাগ উঠলেই ভাঙ্গে ফাঁদ..
লক্ষ্য স্থির যেখানেই থাক
নই মানুষ, নই ছাগ ,
আমি জাতীয় আমি বাঘ" ।

প্রতিবছর প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে কিছু না কিছু দিবস পালিত হয়, আর সেই সব দিবসের মধ্যে পড়ে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস বা ওয়ার্ল্ড টাইগার ডে। ২৯ শে জুলাই বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবস। বাঘের প্রাকৃতিক আবাস রক্ষা করা এবং সংরক্ষণের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই প্রতি বছর ২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়। বিগত ২০১০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত ব্যাঘ্র অভিবর্তনে এই দিবসের সূচনা। প্রতিবছর বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে এই দিবস পালন করা হয়। বাঘ ভারতের জাতীয় পশু হওয়ার কারণে এই দিবসের মহত্ব আমাদের ভারতবর্ষে বেশি করে ধরা হয়।

আনন্দ পেলেও সুন্দরবনের মানুষের কাছে বাঘ মানে বিভীষিকা।

গল্পে বাঘকে যেভাবে বোকা নিরীহ প্রাণী হিসেবে দেখানো হয়, সুন্দরবনের বাঘ কিন্তু মোটেও তা নয়। প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠা সুন্দরবনের বাঘ শুধু হিংস্রই নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সুন্দরবনের যে অংশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার- এর বাসভূমি তার বেশিরভাগটাই জলবেষ্টিত। চারিদিকে সমুদ্রের নোনা জল, জোয়ারে বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায় জোয়ার ভাটার দরুন অনবরত পার ভাঙছে। উপরি রয়েছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়।

এরকম সংকটময় পরিবেশে বেঁচে থাকতে নিয়মিত প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাঘকে। বুদ্ধিও খাটাতে হয় বৈকি। সুন্দরবনের বাঘেদের চরিত্র ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। সুন্দরবনের বহু মানুষ হত্যাই তার উদাহরণ। বাঘেরা এখন খুব চালাক হয়ে গেছে।

বাঘ আগে যখন কাউকে আক্রমণ করতো, সেখানে আবার শিকার পাওয়া যাবে, এই আশায় বেশ কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকতো তাহলে মৌলিরা সাবধান হয়ে যেত। সেদিকে আর তারা কেউ ভিড়ত না। কিন্তু বাঘেরা এখন এক জায়গায় মানুষকে আক্রমণ করার পর, পরের দিন আবার অন্য জায়গায় হানা দিচ্ছে। ফলে জঙ্গলে যারা যায়, তারাও বাঘেদের গতিবিধি আন্দাজ করতে পারছে না।

২০০৯ সালে মে মাসে আইলার পর, জঙ্গল থেকে বসতিতে বাঘের অনুপ্রবেশ যথেষ্ট বেড়ে যায়। শুধুই আয়লা কেন? এর পর বিভিন্ন ধরনের যে সব ঘূর্ণিঝড় গুলো গেল, এরপরে বাঘের লোকালয়ে প্রবেশ তো আছেই। অনেক মানুষ যারা গ্রামবাসী, নিজেদের দরকারে যেমন মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা, জ্বালানি কাঠের জন্য জঙ্গলে তাদের যেতেই হয়। এর ফলে তাদের বাঘের আক্রমণে পড়ে যেতে হয় মাঝে মাঝেই। ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সুন্দরবনের চোরাশিকারী ও বাঘের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সংকটের মুখে পড়ছে আমাদের জাতীয় পশু। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। এর জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

পায়ে পড়ি বাঘ মামা করোনাকো রাগ মামা, তুমি যে ঘরে কে তা জানতো.. গান শুনিয়ে বাঘকে বশে আনার কৌশল শিখিয়েছিলেন বরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। শিবরাম চক্রবর্তীর 'আমার বাঘ শিখা, ' ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুধর এর বাঘ শিকার' গল্পেও বাঘকে বোকা হিসেবে চিনেছে বাঙালি, কিন্তু বাস্তবে আদতে কি বাঘ বোকা?

সুন্দরবনের বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত, বলা হয়ে থাকে শিকারের জন্যই নাকি এদের জন্ম, আমরা শহরের লোকেরা বাঘকে মামা সম্বোধন করে

©google

বাঘ বনের সৌন্দর্য। কথায় বলে "যাকে যেখানে মানায়"! তাই আমাদের জাতীয় পশু কিসে ভালো থাকবে কি করলে ভালো হবে, কিভাবে আমরা বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারব, তা দেখা দরকার। কখনো কখনো কিছু হিংস্র উপস্থিতি প্রকৃতিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলে। তাই 'ভয় রোমাঞ্চ বেঁচে থাকুক মানুষের মনে আর হিংস্ররা বেঁচে থাকুক প্রকৃতির কোলে'..

সঞ্চালিকা
( টিভি ও রেডিও চ্যানেল)

## বাস্তুতন্ত্রে মৌমাছির গুরুত্ব
সৈকত কুমার বসু

মাধবী আর মধুপের মিতালী শুধু গানে নয় আমাদের জীবনেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মৌমাছির মতো কীটপতঙ্গ না থাকলে গাছে ফুল ফুটত না, ফল হতো না। প্রায় ৯০ ভাগ বন্য উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটায় মৌমাছি। পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশেই মৌমাছি রয়েছে, এক অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া। প্রজাতির হিসেবে প্রায় ২০,০০০, ৯টি স্বীকৃত বংশের অধীনে। পৃথিবীর যেখানেই কীটপতঙ্গ-পরাগায়িত ফুলের উদ্ভিদ রয়েছে।

আমাদের দেশে সাধারণত চার ধরনের মৌমাছি দেখা যায়। রকি মাউন্টেন বি, লিটল বি, ইন্ডিয়ান বি এবং ইউরোপিয়ান বি। এগুলি ছাড়াও কেরালায় স্টিংলেস বি নামে পরিচিত আরেকটি প্রজাতি পাওয়া যায়। তারা মোটেও দংশনহীন নয়, আসলে তাদের স্টিংগার সম্পূর্ণরূপে বিকশিত নয়। তবে এরা খুব ভালো পরাগায়নকারী। তারা বছরে ৩০০-৪০০ গ্রাম মধু উৎপাদন করে। যেখানেই ফুল গাছ থাকবে সেখানেই মৌমাছি থাকবে। তারা খুবই দক্ষ এবং বুদ্ধিমান। কারণ মৌমাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় গাছে ফুল ও ফল ধরে। মৌমাছির মত পোকামাকড় না থাকলে গাছে ফুল ও ফল থাকত না।

মৌমাছি দলে দলে উপনিবেশে বাস করে। প্রতিটি মৌচাকে একটি বড় পরিবার বা সমাজে বাস করে। একটি কলোনিতে তিন ধরনের মৌমাছি থাকে। রানী মৌমাছি, কর্মী মৌমাছি এবং পুরুষ মৌমাছি। রাণী মৌমাছি দলের নেতা এবং আকারে বড়।

মৌমাছি তাদের মধুর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। কিন্তু এই মধু আমাদের জন্য মৌমাছিরা তৈরি করে না। বরং শীতকালে নিজেদের জন্য মধু সংগ্রহ করে। তারা প্রয়োজনের তুলনায় ২-৩ গুণ বেশি মধু উৎপাদন করে। আর সুযোগ বুঝে আমরা সেই অতিরিক্ত মধু গ্রহণ করি। গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে শুধু মধু উৎপাদনই নয়, মৌমাছির হুল থেকে সংগৃহীত বিষও রোগ নিরাময় করতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনীর সীমান্ত রক্ষায় মৌমাছি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। যার জন্য সীমান্তে মৌমাছি পালন করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানী
লেথব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা
saikat.basu@alumni.uleth.ca

## দ্য ফাইনম্যান পয়েন্ট
তুহিন সাজ্জাদ সেখ

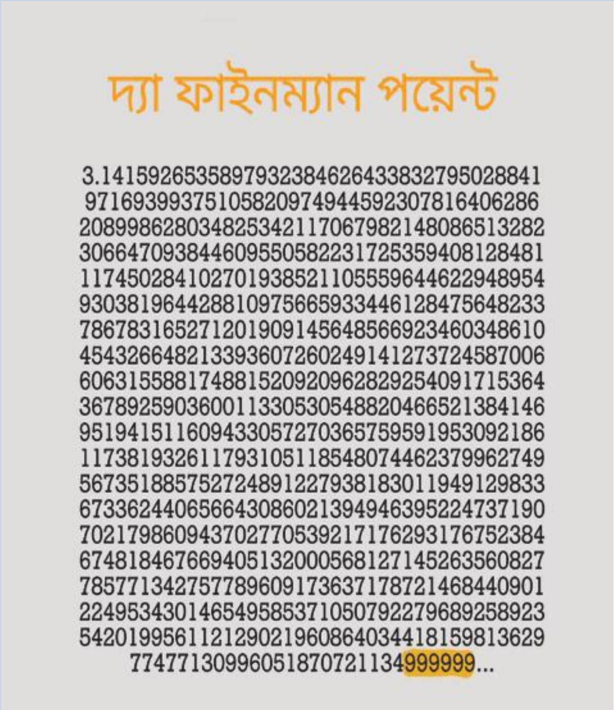


ফাইনম্যান পয়েন্ট হলো পাই ($\pi$) এর সাংখ্যিক মানের দশমিক বিস্তৃতির সেই অবস্থানের নাম যেখানে পরপর ছয়টি নয়ের (৯) একটি ক্রম প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ বিন্দু টির নামকরণ পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের নামে করা হয়েছে, যিনি কথিতভাবে রসিকতা করেছিলেন যে তিনি সেই বিন্দু পর্যন্ত পাই-এর অঙ্কগুলি মুখস্থ করতে চান এবং তারপরে "......" লিখতে চান। সাধারণত আমরা যাঁরা বিজ্ঞান পড়ি তাঁরা পাই এর মান বলতে "২২/৭" কিংবা "৩.১৪" বলে কাজ চালিয়ে নিই। কিন্তু পাই এর মান আসলেই "৩.১৪.(ইনফি-নিটি)"। এর কারণ পাই একটি অমূলদ সংখ্যা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফাইনম্যান পয়েন্ট দশমিক বিন্দুর পরে ৭৬২ তম অঙ্কে ঘটে, বিজ্ঞানী ফাইনম্যান দশমিকের মানের ওই সংখ্যা পর্যন্ত পাই এর মান মনে রাখতে ইচ্ছুক।

১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলশের একজন স্ব-শিক্ষিত গাণিতিক প্রতিভা পাই ($\pi$)(সংখ্যা পাই) কে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তিনি উইলিয়াম জোনস, একজন কৃষক পুত্র, ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে লানফিহাঙ্গেল ট্রে'র বেইর্ড নামে একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় দাতব্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে একজন গণিতবিদ হিসেবে পরিচিত হন। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিসরে পাই এর ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু করেন।

তবে প্রতীকটির ব্যবহার বিজ্ঞানী লিওনহার্ড অয়লার দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে। জর্জেস বুফন নামে একজন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি গণিতবিদ সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে পাই ($\pi$) গণনা করার একটি উপায় তৈরি করেছিলেন। তবে আমাদের দেশের পণ্ডিত আর্যভট্ট তাঁর আর্যভট্টিয়াম গ্রন্থে পাই এর মান ২২/৭ বা ৩.১৪ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, একটি বৃত্ত দেওয়া হয়েছে, এখন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে যেকোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে এই ধ্রুবক অর্থাৎ পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তবে একইভাবে এটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে এর ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাতের সমান। যাইহোক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাই এর মান ৩.১৪ লিখলেও আপনারাও একটু চেষ্টা করে দেখতে পারেন, পাই এর মান ফাইনম্যান পয়েন্ট পর্যন্ত মনে রাখার।

## ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন ৩৭তম প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন হল

**ঋতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**

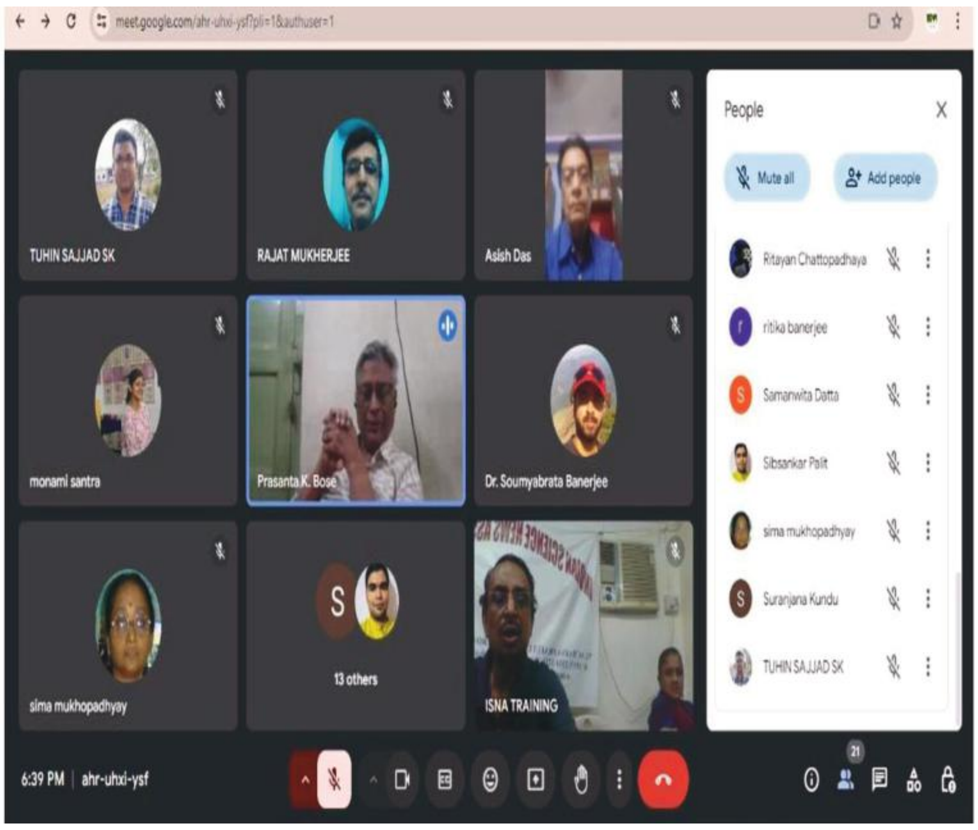


গত ২৪শে জুলাই, ২০২৪ ছিল ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ এ অ্যাসোসিয়েশন, রাজাবাজার, দ্বারা আয়োজিত ৩৭তম প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী দিবস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ এই কর্মসূচিকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছে। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অনলাইন অ্যাপ, গুগল মিট-এর মাধ্যমে এই কর্মসূচিটি সন্ধ্যা ৫টা থেকে শুরু হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সভাপতি প্রশান্ত কুমার বসু, অ্যাসোসিয়েশন সচিব অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আহ্বায়ক ড. অমিত কৃষ্ণ দের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং এসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞান যোগাযোগ এবং জনসঞ্চার মাধ্যম অনুশীলন' বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতায় এর প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন কলকাতার আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা এবং শিক্ষা কেন্দ্রের সদস্যা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা ও এমেরিটাস ফেলো বিজ্ঞানী ড. পাপিয়া নন্দী।

এর পরে, সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় এবং এই কর্মসূচি থেকে তাদের প্রত্যাশা জানতে চাওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাসমূহ এই কর্মসূচিতে অংশ করেন। দুজন সমন্বয়কারী যারা ৩৬তম প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী ছিলেন তারাও নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন এবং তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন। আরও কয়েকজন বক্তা যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা তাঁদের নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন।

পরিশেষে, অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রবীর কুমার সাহা প্রধান অতিথি এবং এই কর্মসূচিতে যোগদানকারী অন্যান্য বক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আসন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান।

ছাত্রী,
ইসনা

## জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপন

**সঞ্জিত কুমার সাহা**

গত ১লা জুলাই, ২০২৪, জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা আয়োজিত একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে । প্রতি বছরের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ধন্বন্তরি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিনকে স্মরণ ও উদযাপন করার জন্য এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান দুই বক্তা ছিলেন ডাঃ প্রকাশ কুমার হাজরা, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, এবং ডাঃ জয়দেব রায়, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ।

ডাঃ হাজরা বলেন, ডাক্তারদের কাজ শুধু রোগী দেখা এবং পয়সা উপার্জন নয়, বরং ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য সহৃদয় ডাক্তার এবং কিছু ভালো মানুষ তৈরি করে যাওয়া। একাজে তিনি নিজেও নিয়োজিত আছেন। বেসরকারি নার্সিং হোমে বসে তিনি বিনা মূল্যে রোগীও দেখেন। শুধু মাত্র ব্যাবসায়িক স্বার্থ না দেখে, সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিলে, সাধারণ মানুষেরাও ডাক্তারদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, বছরের পর বছর শুধুমাত্র তরমুজের বীজ লাগালেই আরো বড় তরমুজ পাওয়া যায় না, তার জন্য সঠিক সময়ে মাটিতে সার, জল ও চাষ দিতে হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি বোঝাতে জিনগত বিভিন্ন রোগ, যেমন মোটা হয়ে যাওয়া, ফ্যাটি লিভার, খারাপ কোলেস্টেরলের সমস্যা কিভাবে এখন জিনগত প্রযুক্তির মাধ্যমেই বাদ দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধেও একটি ধারণা তিনি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন সুস্থ থাকতে হলে, খাবারে লবণের পরিমাণ কমাতে হবে এবং শাক, সবজি বাড়াতে হবে। আশার আলো হিসাবে তিনি বলেন, অস্ত্রোপচার ও রোগ নির্ণয়ে কৃত্তিম মেধা আগামী দিনে জীবিকার সুযোগ আরো বেশি তৈরি করবে।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়দেব রায় মূলত বাচ্চাদের মেদবহুলতা বা স্থূলতা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, আর্থ-সামাজিক কারণ মেদবহুলতার জন্য দায়ী। বাকি এক শতাংশ হলো হরমোনাল বা জিনগত কারণ। মা, বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই এখন প্যাকেটজাত প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য খেতে বেশি অভ্যস্ত। প্যাকেটজাত প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য যেমন পিজা, পাস্তা এবং ঠান্ডা পানীয়ে প্রচুর ক্যালোরি থাকে।

বেশিরভাগ স্কুলেই এখন খেলার মাঠ নেই। স্বভাবতই বাচ্চাদের শারীরিক কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। যতটা ক্যালোরি শরীরে যাচ্ছে তা খরচ হচ্ছে না। ফ্যাট বা চর্বি রূপে শরীরে সঞ্চিত হচ্ছে এবং বাচ্চারা প্রয়োজনের তুলনায় মোটা হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন এ থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের '৫২১০ কর্মসূচি' নিতে হবে। অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে দিনে ৫ ধরণের ফল ও শাকসবজি খাওয়াতে হবে; দৈনিক ভিডিও গেম, মোবাইল বা টিভি দেখার সময় সীমা দুই ঘন্টার নিচে নামিয়ে আনতে হবে, বাচ্চাদের দৈনিক এক ঘন্টার শারীরিক শ্রম অর্থাৎ খেলাধুলা করতে হবে, শর্করা সমৃদ্ধ বোতলবন্দী ঠান্ডা পানীয় বর্জন করতে হবে।

কম পুষ্টি এবং অতিরিক্ত পুষ্টি দুটিকেই তিনি অপুষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করেন। বয়স অনুসারে বাচ্চার ওজন ঠিক আছে কিনা সেটা নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি বি এম আই চার্ট বা শরীরের ভর সূচক লেখচিত্র দেখে উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের ওজন ঠিক আছে কিনা তা নির্ণয় করে দেবেন।

পরিশেষে, মেদবহুলতা থেকে মুক্তির মাধ্যমে বাচ্চাদের রোগ নিরাময়ে প্রতিটি অভিভাবককে ৫২১০ কর্মসূচিতে আসার অনুরোধ জানিয়ে ডাক্তার জয়দেব রায় তার বক্তব্য শেষ করেন।

জাতীয় চিকিৎসক দিবসে দুই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের রোগ নিরাময় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধিত এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

বিজ্ঞান
সম্প্রচারক, কালিম্পঙ

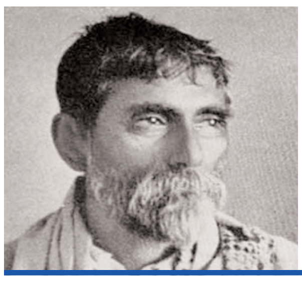

# বিজ্ঞান কহন

কলকাতা/সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪, সোমবার, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা


## "ঈশ্বরকণা তোমাকে"

**প্রশান্ত কুমার বসু**

পেশায় তিনি শিক্ষক। কিন্তু লেখা তার নেশা। মূলত তিনি একজন কবি। কিন্তু তাঁর চিন্তা ভাবনা একটু আলাদা, অন্যদের তুলনায় একটু অন্যরকম। বিজ্ঞান এসে ধরা দেয় তাঁর রচনায় বারংবার। তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ "আমার ঈশ্বর"-এ কবির ভাবনায় ঈশ্বর হলেন পদার্থের ভর সরবরাহকারী ঈশ্বরকণা। হিগস বোসন। আর এই কাব্যে ঈশ্বরকণার সাথে জুড়েছে মহাকাল। তথাকথিত কাল্পনিক ঈশ্বর। তিনের মিশেলে এক ত্রিবেণী সঙ্গম।

চন্দন আচার্যর দ্বিতীয় সংকলন অনন্যার সাথে-র প্রস্তাবনায় উঠে এসেছে একই চিন্তাধারার প্রতিফলন। এবারের কাব্যভাবনা কখনও স্পর্শ করেছে আইনস্টাইনের স্পেস টাইম, কখনও বা ফোর্থ ডাইমেনশন। আবার কখনও বা ছুঁয়ে গিয়েছে দ্য ফাইভ এজেস অফ দ্য ইউনিভার্স। ইনফ্লেশন, স্টেলিফেরাস, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি। এসেছে পদার্থ ও প্রাণের গোপনতম রহস্য।

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য কবি। কবিতা রচনা করেন তাঁরা অনায়াস সাবলীলতায়, সুললিত ছন্দে। অনেকে বলেন কবিতা লেখা সহজ। কিন্তু কবিতা পড়া কঠিন, বোঝা আরও কঠিন। আর সমালোচনা সব থেকে কঠিন, বিশেষ করে সমালোচক যদি হন আমার মত এক সামান্য, মেঠো গদ্য লেখক। তার ওপর যদি তাঁর হাতে এসে পরে বিজ্ঞানবোধে সম্পৃক্ত চন্দন আচার্যর মত কবির দুটি সংকলন, সমস্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

কবি তিনি। ভাবুক তিনি। তবে তিনি ভাবলেশহীন ভাবনায় ভেসে চলেন না। সীমিত শব্দ সংগ্রহে তাঁর ভাবনা আবর্তিত হয় বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই। প্রতিটি ৫৬টি সনেটে বিভক্ত সংকলনেই কিছু শব্দ আসে ঘুরে ফিরেই। যেমন স্টেলিফেরাস তার একটি প্রিয় শব্দ। বারবারই ফিরে আসে। এই শব্দের চয়ন কিন্তু তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতা নয়। বরং কিছুটা ইচ্ছাকৃত। না হলে তিনি বিজ্ঞানকে ছোঁবেন কি করে,বোঝাবেন কি করে? আমার ঈশ্বর সংকলনে একই শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন:

কঠোর সাধন ব্রতে সাধকের মন  
তবু বড় লুকোচুরি তোমার দর্শনে  
পাতাল প্রদেশে আজ হল কলিসন  
মুখোমুখি ধুন্ধুমার প্রোটনে প্রোটনে...  
অবশেষে এলে বুঝি আমার ঈশ্বর  
দিলে দেখা অধমেতে সতত ভাস্বর!

আমরা জানি না কোন বিষয়ের শিক্ষক তিনি? তবে রসায়নশাস্ত্রের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা তাঁর যে অত্যন্ত প্রিয় বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমোক্ত সংকলনেই প্রথম কবিতা হিসেবে স্থান পেয়েছে "স্টেলিফেরাসের যুগ" যেখানে তিনি বলেছেন:

দ্বাপর পেরিয়ে আজ মহাকলিকাল  
স্টেলিফেরাসের যুগ পেরোয় সকাল

একই সঙ্গে মহাভারত স্মরণ করে বলেছেন:

দেখাও আমায় তুমি হে পার্থসারথি  
খুলে দাও সব কিছু সাবেক বন্ধন  
দেখি আমি প্রাণভরে কালের আরতি  
যতটা দেখাবে তুমি নন্দের নন্দন....

"অনন্যার সাথে"র পরিচিতিতে বলা হয়েছে অনন্যা আসলে কবির মানস প্রতিমা। বিশ্বজনীন প্রকৃতি। আর কবি মহাকালিক পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই তো বিশ্বসৃষ্টি।.... কণা, শক্তি, স্থান-কাল অতি ছোট পরিসরে মিলেমিশে সে একাকার।.... শুরুর সময়। সৃষ্টির আদিতম ঘটনা।। বিগ ব্যাং।.... এমনই প্রতিটি কবিতার পরতে পরতে মিশে আছে অনন্যার সঙ্গে কবির একাত্মতা।....

দ্বিতীয় এই সংকলনটির উৎসর্গ পত্রে কবি বলেছেন "ঈশ্বরকণা তোমাকে!" আর বোধহয় নতুন করে এই সংগ্রহ দুটি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু থাকে না। শব্দ চয়নে পৌনঃপুনিকতার প্রভাব না পড়লে প্রকাশকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক সঙ্গে বলা যেত "বাংলা কাব্যে এক নবতম ভাবনার সংযোজন!" সংকলন দুটির প্রচ্ছদ ভালো, ছাপা ভালো, বাঁধাই ভালো। কাব্যমহলে নিশ্চয়ই আনুকূল্য পাবে, আমরা এই আশা রাখি।

(আমার ঈশ্বর/অনন্যার সাথে  
চন্দন আচার্য;  
মূল্য:  
১০০ টাকা/১৫০ টাকা: পাঠক)  
সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন

## সায়েন্টুন

**সাহনি সরকার**

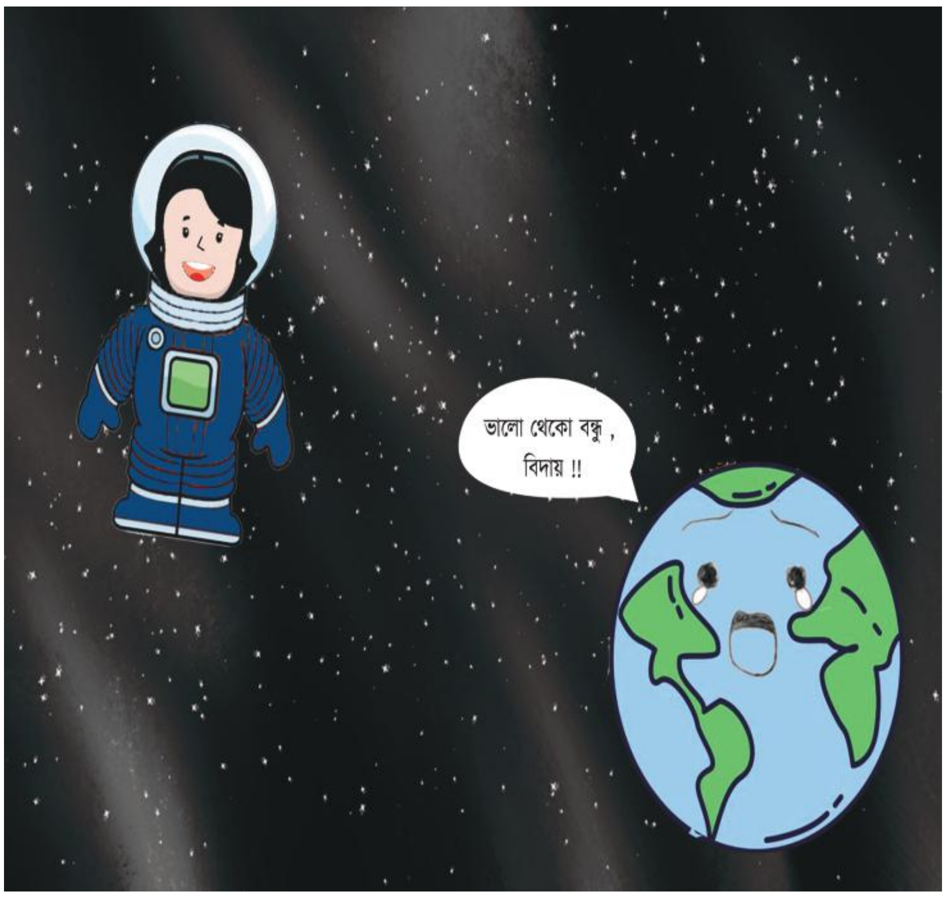



### নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com



### সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু  
যুগ্ম সম্পাদক: ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য: পথিক গুহ, সুধেন্দু মণ্ডল, টি ভি ভেঙ্কটশরণ, মানস চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, অমিত কৃষ্ণ দে, সুমিত্রা চৌধুরী, বুড়োশিব দাশগুপ্ত, দেবপ্রসন্ন সিংহ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, মানসপ্রতিম দাস, শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী দে, আশিস দাস, অর্পিতা চক্রবর্তী, রাতুল দত্ত ও বকুল শ্রীমানী

সম্পাদনা-সহকারী  
সায়রী বিশ্বাস, তুহিন সাজ্জাদ সেখ, সৈকত কুমার বসু, তনুশ্রী দে, সেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, ঝুমুর দত্তগুপ্ত,

কারিগরি উপদেষ্টা: তনুশ্রী দে ও শিব শঙ্কর দত্ত



৩৭ তম ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,  
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,  
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে  
ড. অমিত কৃষ্ণ দে কর্তৃক প্রকাশিত  
ই-মেল- isnatraining@gmail.com  
website: www.scienceandculture-isna.org



**© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA**